লক্ষ করেছি, বাবা যখন যেটা করেন, মনপ্রাণ ঢেলে করেন। নিজের কাজটুকু নিয়ে একাগ্রচিত্তে ডুবে থাকেন। এইভাবেই 'কর্মক্ষেত্র', এইভাবেই 'ভ্রমণ', এইভাবেই 'ছেলেবেলা', এইভাবেই 'কালের কষ্টিপাথর', এইভাবেই 'হীরু ডাকাত', এইভাবেই 'বিষাদগাথা', এইভাবেই ছবি তোলা, এইভাবেই ছবি আঁকা— যখন যেটা, তখন শ্বাসপ্রশ্বাসে সেটা। নিজের রক্তপ্রবাহে সেটা। সেইজন্যই কোন ফাঁকে কোন কাজটা মহীরুহ হয়ে উঠল, সেটা বোঝার অবকাশ পান না। কারণ যখন সেটা দূর থেকে মহীরুহ হয়ে চেনা যাচ্ছে, তখন তো তিনি আর সেই কাজটাতে একাগ্র হয়ে নেই, তিনি তখন অন্য কোথাও, অন্য কোনও কাজে মগ্ন।

যখন যে কাজটা করবেন ঠিক করেন, তখন সেটা করেই ছাড়েন। তখন কোনও বাধা, কোনও বিপত্তিই বাবাকে টলাতে পারে না। ভয়ানক ক্ষীণ দৃষ্টিশক্তি নিয়ে, কার্যত প্রায় অন্ধ অবস্থায় একা ইউরোপে যেতে দেখেছি। নিজে নতুন ধরনের দৈনিক পত্রিকা করবেন ভেবে বিশ্বখ্যাত পত্র-পত্রিকার প্রধানদের সঙ্গে একান্ত আলোচনা করে এসেছেন। তখনকার অখণ্ড সোভিয়েত রাশিয়ায় পনেরো দিন এ মাথা থেকে ও মাথা ঘুরে এসে কলকাতায় সকালে ফিরে সেদিনই সন্ধ্যার বিমানে রওনা হয়ে হেলসিঙ্কিতে সংবাদপত্র সম্মেলনে চলে গেলেন। ঠিকঠাক দেখতে না পাওয়ার জন্য কয়েকবার তো ভুল সময়ে এয়ারপোর্টে পৌঁছে প্লেন প্রায় মিস হতেও বসেছিল।

আন্টার্কটিকায় একটা ছোট ক্যামেরায় ভ্রমণচিত্র তুলতে গিয়ে সমুদ্রের মধ্যে পড়ে যাবার ঝুঁকি নিয়ে বোটচালকের পুনঃপুনঃ নিষেধ সত্ত্বেও রাবার বোটে বারবার উঠে দাঁড়িয়েছেন। আন্টার্কটিকায় ছবি তোলার সময় তুষারে তাঁর উরু পর্যন্ত ডুবে যাওয়ার কথা তো এখন অনেকেই জানেন। কয়েক বছর আগে রোয়ান্ডার জঙ্গলে জলে-কাদায়, একা আছাড় খেতে খেতেও গরিলার ছবি তুলে এনেছেন। এইসব বিপুল সাহসের কাজ বাবার একেবারেই কঠিন লাগে না। পরে আর সেসব কষ্ট, অসুবিধা মনেও করতে পারেন না।

মহাশ্বেতা সমাজদার